সৈয়দ মুজতবা আলীঃ জীবন ও সাহিত্য

এক অর্থে লেখকের লেখার মধ্যেই তাঁর আত্মজীবনী থাকে। লেখক তাঁর চেনা পৃথিবী থেকে উপাদান নিয়ে কীভাবে তাঁর আখ্যানের আলেখ্য গড়ে তোলেন-- এ নিয়ে সাধারণ পাঠকের কৌতূহলের অন্ত নেই। লেখকের যাপিত জীবন শিল্পের আঙিনায় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা এও জানি, যে মানুষ দুঃখ ভোগ করেন আর যে মানুষ লেখেন তাঁরা এক নন! তবু কোনো প্রতিভাকে বুঝতে তাঁর জীবনের কাছে যেতেই হয়। বাধ্যবাধকতা নেই কোথাও, 'চাচা কাহিনী'র সূত্রে সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন কাহিনী হয়তো আমাদের পৌঁছে দিতে পারে বহুমাত্রিক পাঠ অনুভবে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনী লিখতে গিয়ে বেশিরভাগ আলোচক নির্ভর করেছেন মুজতবা সহোদর সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'মুজতবা কথা'- য়। সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৯০৪ খৃস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর সিলেট জেলার করিমগঞ্জ শহরে। বাবার নাম সৈয়দ সিকান্দার আলী, যিনি ছিলেন সৈয়দ আহ্‌মদ মতওয়াককালীর বংশধর। মতওয়াককালী শব্দের অর্থ হল যিনি আল্লাহ্‌র ওপর নিজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মুজতবা আলীর মা আমতুন মান্নান খাতুন ছিলেন জমিদার মোহ্‌সেন চৌধুরীর কন্যা। ধর্মপ্রাণ পারিবারিক পরিমন্ডলে মুজতবা আলীর বেড়ে ওঠা। বাবার যেহেতু বদলির চাকরি, ১৯০৫ সালে চলে আসেন হবিগঞ্জ মহকুমার চাড়ডাঙ্গা গ্রামে। ১৯০৮-এ সুনামগঞ্জ, তারপর ১৯১২ সালে বাবার সঙ্গে মৌলবীগঞ্জে বাস করেন। ১৯১৫ সালে মৌলবীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এর পর তাঁর বাবার আবার বদলি হওয়ার কারণে সিলেট শহরে চলে আসেন। ১৯১৮ সালে সিলেটের সরকারি হাই স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বিপিন চন্দ্র পাল, দেশপ্রেমিক গুরুসদয় দত্ত, শিক্ষাবিদ আব্দুল করিম প্রমুখ। ১৯১৯ সালে গোবিন্দ্র নারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেটে যান এবং দুদিন বক্তৃতা দান করেন 'বাঙ্গালীর সাধনা' ও ' আকাঙ্ক্ষা' বিষয়ে। বক্তৃতা শুনে কিশোর মুজতবা রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে গেলে কী করতে হবে প্রশ্ন নিয়ে। এরপর কী হল মুজতবা- অগ্রজ মুর্তজা আলীর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি- " সিলেট ছাড়ার সপ্তাহ খানেক পরে আসমানী রঙের খাম ও আসমানী রঙের চিঠির কাগজে মুজতবার কাছে কবির নিজের হাতের লেখা জবাব এল। দশ বারো লাইনের এই চিঠির মর্মার্থ ছিল, 'আকাঙ্ক্ষা' উচ্চ হতে হবে এই কথার মোটামুটি অর্থ; স্বার্থ যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গল ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার কি করা উচিত তা এত দূর থেকে বলে দেওয়া যায় না। তোমার

অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। ” কবির এই চিঠি উৎসাহিত করেছিল সন্দেহ নেই, ১৯২১ সালে বাবা মায়ের আপত্তি উপেক্ষা করে সৈয়দ মুজতবা আলী চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। ‘ গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন’ বইতে তিনি লিখছেন – “ গুরুদেবের সঙ্গে তখন সাক্ষাত হত ইংরেজি ও বাংলা ক্লাসে। তিনি শেলি,কীটস আর ‘বলাকা’ পড়াতেন।” তখনকার সময় একমাত্র বিশ্বভারতীতেই ফরাসী, ফারসী, জার্মান ভাষা শেখানো হত। বহুভাষাবিদ মুজতবার ভাষাশিক্ষার শুরু এখান থেকেই। আমরা জানি বাচ্চুভাই শুক্লা এবং সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথম স্নাতক। ১৯২৭ এ বিশ্বভারতীর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চলে যান কাবুলে। দুশো টাকা থেকে তাঁর বেতন অচিরেই একশো বেড়ে যায়, যেহেতু কর্তৃপক্ষ আবিস্কার করেন তিনি জার্মান ভাষাও জানেন। কাবুলে তাঁর মাইনে বৃদ্ধি পেলে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হন এবং শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেন। তাদের অভিযোগ ছিল মুজতবা ‘অনরেকগনাইজড্’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী। আর তারা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ, এম.এ। বেতনে এমন বৈষম্য অন্যায়। এর উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন-“ বিলকুল ঠিক! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তোমাদের ডিগ্রীতে দস্তখত রয়েছে পাঞ্জাবের লাটসাহেবের। তাঁকে আমরা চিনি না, দুনিয়াতে বিস্তর লাটবেলাট আছেন- আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্থানেও গোটাপাঁচেক লাট আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীর সনদে আছে রবীন্দ্রনাথের দস্তখত,- সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি সমস্ত প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।”(গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন) যাহোক কাবুলে থাকার সময় বিভিন্ন অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে ‘দেশে বিদেশে’ কিংবা’ শবনম্’ বই- এ। কাবুল থেকে তিনি ১৯২৯ সালে জার্মানিতে যান হুমব্লট্ বৃত্তি নিয়ে। ‘The Origin of the khojas and their religious life today’- এই বিষয় নিয়ে ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৩ এ জার্মান থেকে ফিরে কোলকাতায় বাবা মায়ের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে ১৯৩৪ সালে অজিত বসুর সঙ্গে আবার যান ইউরোপে। মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে দেশে ফিরে আসেন বরোদার মহারাজার সঙ্গে। ১৯৩৫-৪৪ সাল পর্যন্ত মুজতবা আলী বরোদায় অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৪৫ সালে দেশ পত্রিকায় সত্যপীরের কলাম প্রকাশিত হতে থাকে ধারাবাহিকভাবে। ১৯৪৮ – এ দেশ পত্রিকায় লেখেন দেশে বিদেশে’। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত এই বইটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহদাস পুরষ্কারে সম্মানীত হয়। ১৯৫১ সালে রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় সত্যপীর ও রায়পিথৌরা, এছাড়া ওমর খৈয়াম, প্রিয়দর্শী, দারা শিকো প্রভৃতি ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় অনবরত লিখে চলেন এবং ফিচারধর্মী রম্য রচনাগুলি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। এই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কৈশোর থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকায় যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর লেখার মধ্যে সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। কোনও বিশেষ জায়গার অনুপুঙ্খ বিবরণ স্বাদু ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

১৯৫৫ সালের ২৪ জানুয়ারি পাটনা বেতারকেন্দ্রে স্টেশন ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দেন। দিল্লি বেতারকেন্দ্রে যোগ দেন ১৯৫৬-র মার্চ মাসে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুরোনো কর্মস্থল বরোদায় আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। এই বছরই বিশ্বভারতীতে ইসলামি সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ও জার্মান ভাষার অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬২-র ৭ পৌষ উৎসবে আচার্যের আসন গ্রহণ করে মন্ত্রপাঠ করেন। ১৯৬৫-র জুন মাসে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। ’৬৭ পর্যন্ত বোলপুরে বাস করেন। এরপর কোলকাতায় চলে আসেন। ১৯৭০-এ শেষবার জার্মানিতে যান। সৈয়দ মুজতবা আলীর শেষজীবন কষ্টের। আর্থিক অসচ্ছলতা, অসুস্থতা সব মিলিয়ে করুণ অবস্থা। ১৯৭৩-র অক্টোবর মাসে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। নিজের হাতে লেখালেখি বন্ধ হয়ে আসে। এই বেদনাবহ জীবনেও স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ অটুট ছিল। ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসান ঘটে। আমরা জানি লেখকের মৃত্যু নেই। মানুষের মৃত্যু হলে যেভাবে মানব থেকে যায়, সেভাবেই আমাদের প্রাণ আলো করে রয়েছেন আখ্যানের যাদুকর সৈয়দ মুজতবা আলী।

...

এবারে সৈয়দ মুজতবা আলীর গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করা যাক-

গ্রন্থ	প্রকাশকাল	প্রকাশক
দেশে বিদেশে	বৈশাখ ১৩৫৬	নিউ এজ পাবলিশার্স
পঞ্চতন্ত্র	আষাঢ় ১৩৫৯	বেঙ্গল পাবলিশার্স
চাচা কাহিনী	আষাঢ় ১৩৫৯	নিউ এজ পাবলিশার্স
ময়ূরকন্ঠী	চৈত্র ১৩৫৯	বেঙ্গল পাবলিশার্স
অবিশ্বাস্য	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১	ঐ
পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	বৈশাখ ১৩৬০	বইঘর, চট্টগ্রাম
জলে ডাঙ্গায়	মাঘ ১৩৬০	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ধূপছায়া	পৌষ ১৩৬৪	ত্রিবেণী প্রকাশন
দ্বন্দ্ব-মধুর	বৈশাখ ১৩৬৫	ঐ
চতুরঙ্গ	ভাদ্র ১৩৬৭	বেঙ্গল পাবলিশার্স

শবনম্	রাখী পূর্ণিমা, ১৩৬৭	ত্রিবেণী প্রকাশন
শ্রেষ্ঠ গল্প	অগ্রহায়ণ ১৩৬৮	বাক্ সাহিত্য
ভবঘুরে ও অন্যান্য	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯	ঐ
বহু বিচিত্র	আষাঢ় ১৩৬৯	গ্রন্থ প্রকাশ
শ্রেষ্ঠ রম্য রচনা	ভাদ্র ১৩৬৯	মিত্র ও ঘোষ
টুনি মেম	চৈত্র ১৩৭০	ঐ
প্রেম(অনুবাদ)	শ্রাবণ ১৩৭২	আনন্দ পাবলিশার্স
বড় বাবু	ফাল্গুন ১৩৭২	মিত্র ও ঘোষ
দু-হারা	চৈত্র ১৩৭২	আনন্দ পাবলিশার্স
পঞ্চতন্ত্র(২য় পর্ব)	আষাঢ় ১৩৭৩	বেঙ্গল পাবলিশার্স
হাস্য মধুর	অগ্রহায়ণ ১৩৭১	গ্রন্থ প্রকাশ
পছন্দসই	আশ্বিন ১৩৭৪	মিত্র ও ঘোষ
রাজা উজির	বৈশাখ ১৩৭৬	ঐ
শহর- ইয়ার	ভাদ্র ১৩৭৬	আনন্দ পাবলিশার্স
হিটলার	রথযাত্রা ১৩৭৭	বিশ্ববাণী
কত না অশ্রুজল	নববর্ষ ১৩৭৮	ঐ
মুসাফির	অগ্রহায়ণ ১৩৭৮	ঐ
তুলনাহীনা	বৈশাখ ১৯৭৪	ঐ
পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়	ফাল্গুন ১৩৮২	মিত্র ও ঘোষ
গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	চৈত্র, ১৩৮৮	ঐ

……………….

Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women, Purba Medinipur